স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিকড়া কুলীন গ্রামের দুর্গোৎসব

চঞ্চলকুমার ঘোষ

আদিকথা

কলকাতা মহানগরী থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো শিকড়া কুলীন গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়েছে টাকি রোড। একসময় চলত মার্টিন রেল। লোকে মজা করে বলত জোরে হাঁটলে ট্রেনের আগে পৌঁছে যাওয়া যায়। এই গ্রামের অধিকাংশই ঘোষ পরিবারের।

শোনা যায় এই পরিবারের একজনকে কৌলীন্য প্রদান করে বালিতে জমি দিয়েছিলেন মহারাজ বল্লাল সেন। তার বহু পরে সদানন্দ ঘোষ বিয়ের যৌতুক হিসাবে কুলীন গ্রামের জমিদারি পান এবং নিজের পরিবারের লোকজন নিয়ে পাকাপাকিভাবে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। সময়টা ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ। এই পরিবারের দেবীদাস ঘোষ স্বপ্নাদেশ পান দেবী দুর্গা তাঁর কাছে পুজো চাইছেন।

দেবীদাস ছিলেন ভক্ত, সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজা শুরু করেন, যা বাংলার প্রাচীন পুজোগুলির অন্যতম। সেই সময় কোনও দালানবাড়ি ছিল না। দেবীদাস মাটির দেওয়াল, গোলপাতায় ছাওয়া আটচালা পূজামণ্ডপ তৈরি করে দুর্গাপুজো আরম্ভ করলেন। বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয় এর মাত্র দশ বছর আগে। একশো বছরের বেশি সময় ধরে আটচালাতেই দুর্গাপুজো হত।

সদানন্দ ঘোষ যখন কুলীনগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন গৃহদেবতা শ্রীধর নারায়ণ শিলা। মায়ের পুজো হত শরৎকালে আর গৃহদেবতার পুজো হত সারা বছর ধরে। সময়ের সঙ্গে পরিবারের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বেড়ে চলে। বিশাল এক জমিদারির মালিক হন তাঁরা। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে জমিদার কালীপ্রসাদ ঘোষ আটচালা ভেঙে দিয়ে তৈরি করলেন দুর্গাদালান। পাঁচ খিলান যুক্ত দুই মহলা, প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু দুর্গাদালানে ফুটে উঠেছে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য। দুশো বছর ধরে স্বমহিমায় বিরাজ করছে ঘোষবাড়ির দুর্গাদালান।

বিখ্যাত লেখক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা

প্রসঙ্গত, ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজো সম্পন্ন করেন পাঁচ শরিক—যাদের পরিচিতি বড়বাড়ি, মেজবাড়ি, সেজবাড়ি, নবাড়ি, ছোটবাড়ি বলে। প্রতি বছর এক এক শরিক পুজোর দায়িত্ব নিলেও অন্যরাও এতে অংশগ্রহণ করেন।

সময়, কাল, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনুসারে তিনশো চব্বিশ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজোয় অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তার প্রাণসত্তা, ঐতিহ্য, আচারনিষ্ঠা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

প্রাক্‌পূজা

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী স্বয়ং বলছেন, যখন আমি 'দুর্গম' নামের মহিসাসুরকে বধ করব তখনই আমি দুর্গাদেবী নামে খ্যাত হব। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে প্রথম দেবী দুর্গার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় : ''তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্/ দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥'' অর্থাৎ যিনি অগ্নিবর্ণা, যিনি তপস্যার দ্বারা জ্যোতির্ময়ী, যিনি বৈরোচনী, কর্মফলের নিমিত্ত যিনি উপাসিকা, সেই দুর্গা দেবীর শরণ নিলাম।

অব্যক্ত পরম ব্রহ্মের যে-শক্তি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করছেন তিনি কখনও দৃশ্যরূপে কখনও অদৃশ্যভাবে বিশ্বের কল্যাণ করছেন, তিনিই দুর্গা। তাঁকে দুঃখের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় বা জানা যায়, তাই তিনি দুর্গা।

বাংলায় তিনটি মতে দুর্গাপুজো হয়ে থাকে—পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র। ঘোষবাড়ির পুজো হয় বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ অনুযায়ী, যার শুরু জন্মাষ্টমীর দিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের কাছে এত পবিত্র দিন আর নেই। যেকোনও শুভকাজ শুরুর প্রকৃষ্ট সময় এটি।

ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজোর যে-কাঠের কাঠামোটি বর্তমানে ব্যবহার করা হয় তা ঠিক কবেকার জানা যায় না। তবে পরম্পরা অনুসারে এটি দুশো বছরের বেশি প্রাচীন। প্রতিবছর দেবীপ্রতিমা বিসর্জনের কয়েকদিন পর কাঠামোটি পুকুর থেকে তুলে নিয়ে এসে দুর্গাদালানে রেখে দেওয়া হয়। বংশ-পরম্পরায় যে-কুমোর প্রতিমা নির্মাণ করে থাকেন তিনি জন্মাষ্টমীর আগের দিন একটি নতুন বাঁশের চটা দিয়ে যান। পরদিন তাতে সিঁদুর মাখিয়ে কাঠামোর মাঝখানে বেঁধে দালানের মাঝে বেদিতে রাখা চৌকিতে স্থাপন করা হয়।

দুর্গাদালানের কাছেই রয়েছে করুণাময়ী মায়ের মন্দির। তার সংলগ্ন বোধনতলা। একটি উঁচু বেদির মাঝখানে বড় বেলগাছ। গ্রামের সব মানুষের কাছে খুব পবিত্র স্থান। জন্মাষ্টমীর পরদিন এখানে হয় নন্দোৎসব। বেদির এক জায়গায় গর্ত করা হয়। গ্রামের মানুষরা দই, কলা, দুধ, মিষ্টি দিয়ে যান। তার কিছুটা অংশ গর্তে ঢেলে দিয়ে বাকিটা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেন পুরোহিত। ঢাকি, ঢুলি যাঁরা বংশপরম্পরায় ঘোষবাড়ির পুজোর সঙ্গে যুক্ত তাঁরাও আসেন।

এরপর আসে মহালয়া। এর মধ্যে কুমোর এসে দালানে রাখা কাঠামোর গায়ে খড় জড়িয়ে মাটি দিয়ে দেন। দেবী হন একচালা।

ঘোষবাড়ির লোকজন মহালয়ার সময় থেকে গ্রামে আসতে আরম্ভ করেন। বর্তমানে প্রত্যেক শরিকের বংশধররাই কর্মসূত্রে দেশবিদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন। তাঁরা সকলেই অপেক্ষা করে থাকেন—পাঁচ বছর অন্তর যখন পুজোর পালা আসে অন্তত সেই সময়ে গ্রামের বাড়িতে আসার।

মহালয়ার পরদিন দেবীপক্ষের সূচনা। ওইদিন দালান সংলগ্ন নারায়ণঘরে কুলদেবতা শ্রীধর নারায়ণ শিলার সামনে নতুন ঘটস্থাপন হয়। এইদিন থেকে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিপদাদিকল্পারম্ভ পুজো আরম্ভ। চণ্ডীপাঠ, সকাল-সন্ধ্যা আরতি, ভোগ নিবেদন চলে ষষ্ঠীর সকাল পর্যন্ত। প্রতিপদে ঘট-স্থাপনের পর দালানের এক কোণে একটা বড়

হাঁড়ির মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। একে বলে অধিবাসের প্রদীপ। এটি জ্বলে দশমীর রাত পর্যন্ত।

এর সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন মানুষের আনাগোনা। কেউ প্রতিদিনের পুজোর ফল দেন, কেউ ফুল দেন। চলে অতিথিদের খাবার আয়োজন। পুজোর সমস্ত কাজ হয় গঙ্গাজলে। অতীতে গ্রামের পাশে খাল ছিল। তার যোগ ছিল বিদ্যাধরী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে। তখন জল আসত নৌকায়। এখন বড় বড় জ্যারিকেন ভর্তি জল আসে গাড়িতে। আগে দুর্গাদালান সাজানো হত গ্যাসের বাতি, ঝাড়লণ্ঠন, আমপাতা, গাঁদাফুল দিয়ে। আজ এসেছে আধুনিক উপকরণ।

ঘোষ পরিবারের পূজিত দেবী

পূজারম্ভ

প্রতিমার কাজ শেষ হয় ষষ্ঠীর আগেই। ষষ্ঠীর বিকেলে হয় দেবীর বোধন। বোধন শব্দটির অর্থ জাগরণ। সাধারণভাবে বোধন বলতে আমরা দুর্গাপুজোর আগে একটি অনুষ্ঠান বুঝি। যে-প্রশ্ন স্বাভাবিক—দেবীর বোধন কেন? তিনি কি ঘুমিয়ে আছেন যে তাঁর জাগরণ হবে? তিনি তো সকল জীবের চেতনা, তিনি চিরজাগ্রত। তাঁর জাগরণ কীসের? এই প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামী বলেছেন, ''নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা'' অর্থাৎ যে-ভাব নিত্যসিদ্ধ তাকে হৃদয়ে প্রকট করে তোলাই হল তার সাধ্যতা। তিনি জেগেই আছেন যদিও আমরা সাধারণভাবে তা অনুভব করতে পারি না। সেটি উপলব্ধি করার জন্যই বোধন। আসলে এ দেবীর বোধন নয়, আমাদের অনুভবের বোধন।

প্রচলিত কাহিনি হল, রাবণ রাজার অত্যাচারে যখন বিশ্ব জুড়ে দুর্দশা শুরু হয়েছিল তখন রাবণকে বিনাশ করার জন্য রামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর বোধন করেছিলেন—সেই পুজোই 'অকাল বোধন' নামে বিখ্যাত। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পুরোহিত একটি জলপূর্ণ ঘট বোধনতলায় নিয়ে আসেন, সেটিকে বেলগাছের তলায় স্থাপন করেন। সেখানে পুরোহিত দেবীকে আহ্বান করে তাঁর পুজো, অধিবাস সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানে পুজোবাড়ির লোকজন ছাড়াও গ্রামের

লোকজন থাকেন। ঢাকি-ঢুলির বাজনায় বোঝা যায় মা আসছেন। চারদিকে আনন্দের রেশ। অনুষ্ঠান-শেষে ওই ঘট সমেত বেলগাছের গোড়াটি প্লাস্টিক বা দরমার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় যাতে কেউ তা নষ্ট করতে না পারে।

পরদিন মহাসপ্তমী। সকালে মূল পুরোহিত বোধনতলা থেকে ঘট নিয়ে দুর্গাদালানে এসে দেবীর সামনে স্থাপন করেন। আরও নয়টি ঘট ওই মূল ঘটের সঙ্গে বসানো হয়। প্রতিটি ঘটের উপর থাকে আমপাতা ও ডাব। নয় রঙের নয়টি নতুন কাপড়ের ছোট ছোট পতাকা ঘটে দেওয়া হয়।

এরপর নবপত্রিকা স্থাপন। নয়টি গাছের ডালকে একসঙ্গে বাঁধা হয়—কলাগাছ, ডালিম, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, কচু, অশোক, মানকচু, ধান। এই নবপত্রিকাকে অপরাজিতা লতা, নয়টি পাটের সুতো দিয়ে বেঁধে একটি শাড়ি জড়িয়ে কলাবউ সাজানো হয়। এটি দেবী দুর্গার প্রতিনিধি। শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করার সময় দেবী অষ্ট নায়িকার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা এবং দেবী স্বয়ং—এই নয়জনকে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে গণ্য করা হয়।

এরপর হয় নবপত্রিকা স্নান। সাধারণভাবে বলা হয় কলাবউ স্নান। পুরোহিত এই কলাবউ কাঁধে নিয়ে গ্রামের পথ ধরে চলেন টাকি রোডের লাগোয়া দত্তপুকুরে। ঢাকি-ঢুলি সঙ্গী হয়। থাকেন বাড়ির লোকজন।

এই নবপত্রিকা স্নানের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তে। ''এদিকে শহরের সকল কলাবউয়েরা বাজনা বাদ্দি করে স্নান করতে বেরুলেন। বাড়ির ছেলেরা কাঁসর ও ঘড়ি বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চললো—এদিকে বাবুর কলাবউয়ের স্নানের সরঞ্জাম বেরুল, আগে কাড়ানাগরা, ঢোল, সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চলল, তার পেছনে নতুন কাপড় পরে আশাসোঁটা হাতে বাড়ির দারোয়ানেরা, তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ির বামন, গুরু, সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু...। আশেপাশে ভাগ্নে, ভাইপো ও জামাইয়েরা। তার শেষে নৈবিদ্য লণ্ঠন ও পুষ্পপাত্র শাঁখ ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পুজোর সরঞ্জাম মাথায় মালীরা।''

অতীতে ঘোষবাড়ির কলাবউ স্নানেও ছিল এমনই দৃশ্য। নবপত্রিকা স্নান করিয়ে অভিষিক্ত করার পর তা দুর্গাদেবীর পাশে স্থাপন করা হয়। এরই মধ্যে যে-কাজটি করা হয় তা দুর্গাপুজোর মূল পুরোহিত ও তন্ত্রধারককে বরণ করা। বর্তমান পুরোহিত গৌতম ভট্টাচার্য, চার পুরুষ ধরে পুজো করছেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। পুরোহিতকে ধুতি-উত্তরীয় ও দক্ষিণা দিয়ে বলা হয়, ''আপনাকে এই পুজোয় ব্রতী করা হল।''

এরপর দেবীর মহাস্নান হয় দু-মহলা দালানের বাইরের দালানে। স্নানের সময় বিভিন্ন ধরনের জল, মাটি ছাড়াও নানান দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। জলের মধ্যে থাকে গঙ্গাজল, শঙ্খজল, নারকেল জল, সর্বৌষধি মহৌষধি জল, শিশিরজল, সর্বতীর্থের জল। মাটির মধ্যে গজদন্ত-বরাহদন্তের মাটি, রাজদ্বার-বেশ্যাদ্বারের মাটি। এছাড়াও তৈল, গোময়, দুধ, দই, ঘি। মহাস্নানের সময় মহানৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। তারপর মহাসপ্তমী পূজা। প্রতিদিন ষোলো থেকে আঠারোখানা নৈবেদ্য দেওয়া হয়। সঙ্গে শাড়ি ধুতি গামছা। উপকরণ আগের মতো প্রচুর না

ঘোষ পরিবারের দুর্গাদালান

হলেও চেষ্টা করা হয় যথাসম্ভব নিয়মনিষ্ঠা রক্ষার।

সন্ধ্যায় দেবীর আরতি। দেবীর দুদিকে দাঁড়িয়ে বাড়ির মেয়েরা বিরাট পাখা দিয়ে মাকে বাতাস করেন। গোটা গ্রামের মানুষ চলে আসেন দুর্গাদালানে। আরতির সঙ্গে চলে ঢাকির নাচ। সমস্ত পূজাপ্রাঙ্গণ জুড়ে ভাবাবেগে মেতে ওঠে আবালবৃদ্ধবনিতা। তারপর প্রসাদ বিতরণ।

মহাষ্টমী। দুর্গোৎসবের শ্রেষ্ঠ দিন। ত্রেতাযুগে ভগবান বিষ্ণু রামচন্দ্ররূপে জন্ম নিয়েছিলেন বাসন্তী শুক্লা অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে। তিনি আবার কৃষ্ণরূপে জন্ম নিলেন ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে। এই তিথি হল অসুরবিনাশী শুদ্ধসত্তার আবির্ভাবতিথি। ঘোষবাড়ির পুজোতেও অষ্টমীর দিন সবচেয়ে বেশি আয়োজন হয়। মানুষের ভিড়ে ভরে যায় দালান। দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয়-পরিজন আসেন। প্রকৃতপক্ষে এ এক মিলনের উৎসব।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) এই শিকড়া কুলীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি। বাবা আনন্দমোহন ঘোষ ছিলেন জমিদার। বর্তমান দালানের লাগোয়া ছিল তাঁর বাড়ি। ছেলেবেলায় করুণাময়ী মন্দিরের বারান্দায় বসে খেলা করতেন রাখাল। কালী বা কৃষ্ণ বিষয়ক গান গাইতে গাইতে বোধনতলায় ঘুরে বেড়াতেন। দুর্গাপুজোর শুরু থেকেই পাকাপাকিভাবে তাঁর স্থান হত দুর্গাদালানে। কুমোর মাটির প্রতিমা তৈরি করতেন। রাখাল দেখতেন কেমন করে মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ে উঠছেন। পুজোর সময় একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন মায়ের দিকে। দেখতে দেখতে বালক রাখালের মন ভাবলোকে ভেসে যেত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ, এসেছিলেন নিজের গ্রামে। কিন্তু গৃহে যাননি, বসেছিলেন বোধনতলায়, যেখানে কেটেছিল তাঁর শৈশবকাল। পুত্রের আসার সংবাদ পেয়ে এলেন জননী হেমাঙ্গিনী দেবী। দুচোখে অশ্রুধারা। মাকে প্রণাম করে তাঁর অশ্রুসজল চোখ মুছে দিলেন ঠাকুরের রাখালরাজ।

শুধু রাজা মহারাজ নন, আরও কত সাধুর পদধূলিতে পবিত্র এই দালান কোঠা। এসেছেন শিবানন্দ স্বামী, মঠ-মিশনের কত সন্ন্যাসী। আজও আসেন নিজেদের ভক্তি-অর্ঘ্য উজাড় করে দিতে মায়ের পায়ে।

সন্ধিপুজো

সন্ধি শব্দটির অর্থ মিলন। দুর্গোৎসবের অষ্টমীর শেষ দণ্ড ও নবমী তিথির প্রথম দণ্ডকে (২৪ ও ২৪, মোট ৪৮ মিনিট) সন্ধিমুহূর্ত বলা হয়েছে। এই সময়ে রামচন্দ্র রাবণের দশটি মাথা কেটে তাকে নিহত করেছিলেন। ভিন্ন মতে, দেবীর প্রসন্নতা লাভ করার জন্য রামচন্দ্র একশো আটটি পদ্ম নিবেদন করার সংকল্প করেন। দেবী পরীক্ষাচ্ছলে একটি পদ্ম

সরিয়ে ফেললে রাম দেখলেন একটি পদ্ম কম, তখন তিনি নিজের চোখটি উপড়ে নিয়ে নিবেদন করতে উদ্যত হলেন। সেই মুহূর্তে দেবী মহামায়া এসে পদ্ম ফিরিয়ে দিয়ে রাবণবধের বর দেন।

এই সন্ধিপূজার শুভক্ষণে দেবীমূর্তির সামনে জ্বালানো হয় একশো আটটি প্রদীপ। তার আগে একশো আটটি পদ্ম দিয়ে মাকে অর্চনা করেন পুরোহিত। প্রথম প্রদীপটি জ্বালান তিনি নিজে। তারপর পাঁচ শরিকের বাড়ির পুরুষরা প্রদীপ জ্বালান। আগে মেয়েদের এই প্রদীপ জ্বালাবার অনুমতি ছিল না। বর্তমানে মেয়েরাও প্রদীপ জ্বালান। যখন সমস্ত প্রদীপ জ্বলে ওঠে সে এক অপরূপ দৃশ্য।

আগে সন্ধিপুজোর সময় ঘোষবাড়ির পুজোয় ছাগ, মহিষ দুই-ই বলি হত। কোনও কারণবশত বাধা পড়ায় বলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে বলির প্রতীক হিসাবে সেই খাঁড়াটি দেবীর সামনে রাখা হয়।

অষ্টমীর পর আসে নবমী। নবমীর অর্থই বিদায়ের ক্ষণ। সারাবছরের সব দুঃখকষ্ট ভুলে প্রাণভরে মাকে দেখে নেওয়ার দিন। এই দিনের পুজোর বিশেষত্ব হল, একইসঙ্গে দালানে মা দুর্গা, কুলদেবতা নারায়ণ ও সারদা মায়ের পুজো হয়। এরপর হোম হয়। মন্ত্র উচ্চারণে গমগম করে গোটা দুর্গাদালান।

নবমীর রাত আসে। রাত পোহালেই মা বিদায় নেবেন। সকলের মন বিষণ্ণ। সেই কবে রূপচাঁদ পক্ষী লিখে গিয়েছেন,

''নবমী নিশি পোহাল, কী করি কী করি বলো।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা,
দেখো না বিজয়া এল।
বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা।
যায় কিসে দুঃখ পাসরা, আমারে বলো?
নবমী নিশি প্রভাত, এ কি দেখি বিপরীত।
উমা হয়ে চমকিত, নতশিরেতে রহিল।''

এখানে আধ্যাত্মিকতাকে ছাপিয়ে উঠেছে সাধারণ মানবমন।

দশমী

সকালের পুজো শেষ করে বিসর্জনের পালা। সকলেরই চোখ অশ্রুসজল। শোভাযাত্রা করে বাড়ির ও গ্রামের সকলে শ্রীশ্রীকরুণাময়ীর মন্দির ও বোধনবেদি সাতবার প্রদক্ষিণ করে আসেন। তারপর দালানের বেদি থেকে মায়ের প্রতিমা নামিয়ে একদিকে রাখা হয়।

বিকেলে বাড়ির বউরা মাকে সিঁদুর-মিষ্টি দিয়ে বরণ করেন। মায়ের কানে কানে বলেন, ''মা তুমি আবার এসো।'' বাঁশের ভারায় প্রতিমা তুলে কাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা মাকে নিয়ে যায় টাকি রোডের ধারে দত্তপুকুরে। পথে প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে সেজো, মেজো ও ছোট বাড়ির সামনে মাকে নামানো হয়।

দত্তপুকুরে বিরাট কলার ভেলা আগে থেকে তৈরি করা থাকে। তার ওপর চাপিয়ে সাতবার ঘুরিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। পুকুরের পারে বিরাট মেলা বসে। আগে গোটা অঞ্চলে এই একটি মাত্র পুজো হত। বর্তমানে একাধিক পুজো হলেও কৌলীন্যে আভিজাত্যে সকলের আগে ঘোষবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন হয়।

বিসর্জনকারী সকলেই ভিজে কাপড়ে দালানে আসেন। কঞ্চির কলমে আলতা দিয়ে বেলপাতায় দুর্গানাম লেখেন। তারপর সকলের মধ্যে সিদ্ধি ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সঙ্গে চলে শুভ বিজয়ার আলিঙ্গন আর প্রণাম।

একে একে সকলে ফিরে চলে যে যার ঘরে। পিছন ফিরে দালানের দিকে তাকালে মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এই কদিনের আলোকে উজ্জ্বল মণ্ডপ আজ কেমন নিষ্প্রভ, প্রাণহীন। আবার অপেক্ষা এক বছরের। শুধু প্রার্থনা, ততদিন সকলকে ভাল রেখো মা।